PAPER CUTTING APRIL 2023

সম্পাদকীয় আনন্দবাজার পত্রিকা

WBCS Bengali Compulsory Paper

9000+ WBCS aspirants

জুড়ে আছে আমাদের সঙ্গে ।

WHATSAPP -7047352328

WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER dot COM -

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

Cyber Crime নজরদারির গুরুত্ব

ঝাড়খণ্ডের এক ছোট জনপদ জামতাড়া দেশজোড়া ‘খ্যাতি’ অর্জন করেছে এক বিশেষ কারণে— ভুয়ো ফোনকলের মাধ্যমে আর্থিক জালিয়াতির রাজধানী হিসাবে। সেই ‘খ্যাতি’ প্রায় যায়-যায় এই ‘ব্যবসা’য় অন্য একটি শহরের দ্রুত উত্থানের ফলে। শহরটির নাম, দুর্ভাগ্যজনক ভাবে, কলকাতা। গত কয়েক মাসে সংবাদপত্রের পাতায় বহু বার প্রকাশিত হয়েছে কলকাতা ও শহরতলিতে গড়ে ওঠা ভুয়ো কল সেন্টারের খবর। শুধু শহরের বাসিন্দা দুষ্কৃতীরাই নয়, ভিনরাজ্যের জালিয়াতরাও তাদের কর্মক্ষেত্র হিসাবে কলকাতাকে বেছে নিচ্ছে, এমনটা অনুমান করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। পুলিশ নিষ্ক্রিয়, এমন অভিযোগ করা যাবে না— অপরাধীদের ধরতে না পারলে এই ভুয়ো কল সেন্টারগুলির কথা অজ্ঞাতই থেকে যেত। কিন্তু, এই গোত্রের অপরাধের চরিত্র হল, যতটুকু ধরা পড়ল, তা হিমশৈলের চূড়ামাত্র কি না, সে কথা স্পষ্ট ভাবে জানার কোনও উপায় নেই। ফলে, কল সেন্টার জালিয়াতির বাড়বাড়ন্ত ঠেকাতে পুলিশের সাফল্য কতখানি, সে কথাও নিশ্চিত ভাবে বলা যাবে না। সেই বিচারের প্রয়োজনও নেই— দরকার নজরদারি অব্যাহত রাখা। সাইবার জালিয়াতরা আধুনিক প্রযুক্তির মেঘের আড়াল থেকে অস্ত্র শাণায়, ফলে তাদের শায়েস্তা করতে হলে পুলিশকেও নতুন পথে চলতে হবে। বিভিন্ন সংবাদে, এবং সমাজমাধ্যমে কলকাতা পুলিশের স্বকৃতিত্ব প্রচারের প্রতিবেদনগুলি থেকে অনুমান করা চলে যে, কলকাতা পুলিশ ক্রমে সাইবার প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জন করছে। এ ক্ষেত্রে সাফল্যের মন্ত্র হল, অপরাধীদের চেয়ে এক কদম এগিয়ে থাকা। প্রথাসিদ্ধ পথ নয়, নতুন পথ খুঁজে নেওয়া। এবং একই সঙ্গে এই নতুন বিপদ সম্বন্ধে নাগরিকদের সচেতন করে চলা।

অপরাধের চরিত্র পাল্টালে নজরদারির চরিত্রও পাল্টানো যে জরুরি, তার একটি ভিন্নতর প্রমাণ সম্প্রতি পাওয়া গেল। নার্কোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো জানিয়েছে যে, কলকাতার বিভিন্ন রাস্তার ধারের ধাবা ক্রমে মাদক ব্যবসার ‘হটস্পট’ হয়ে উঠছে। দীর্ঘ দিন নজরদারি চালিয়ে চিহ্নিত করা গিয়েছে এমন একাধিক ধাবা, বোঝা গিয়েছে লেনদেনের ধরন। সেই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত একাধিক ধাবা কর্মীকে সোর্স হিসাবে ব্যবহার করাও সম্ভব হয়েছে। সংবাদটি তাৎপর্যপূর্ণ। শুধু কলকাতায় নয়, ভারতের কার্যত সব শহরেই মাদকের ব্যবসা পুলিশ ও মাদক নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাছে মাথাব্যথার কারণ। এত দিন জানা ছিল যে, মূলত বার, পাব ও নাইটক্লাবগুলিই এই ব্যবসার কেন্দ্র— সেখানেই মাদকের লেনদেন হয়। কিন্তু, শহরের রাস্তার ধারে, একেবারে প্রকাশ্যে ব্যবসা করে চলা ধাবা-রেস্তরাঁগুলিও যে এই ব্যবসার কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে, এই কথাটি নেহাত কাণ্ডজ্ঞানের নয়, তার জন্য নজরদারি প্রয়োজন। অপরাধের কার্যপদ্ধতি এবং কেন্দ্র চিহ্নিত করা গেলে পুলিশ বা নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাজ বহুলাংশে সহজ হয়। স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে, কোনও শহরে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যত বাড়ে, শহর যত চলমান হয়, তার অপরাধের চরিত্রও তত বহুমুখী হয়ে উঠতে থাকে। যত বেশি বাইরের লোক শহরে ঢোকে, এবং যত বেশি লোকের আনাগোনা চলতে থাকে, ততই কঠিন হয় পুলিশের কাজ। ফলে, কলকাতা শহরকে ঘিরে আর্থিক কর্মকাণ্ডের পরিমাণ যত বাড়বে, পুলিশের প্রস্তুতিকেও তার সঙ্গে তাল মেলাতে হবে। শহরকে সুরক্ষিত রাখতে নজরদারিতে বিন্দুমাত্র গাফিলতি চলবে না।

Supreme Court গণতন্ত্রের ধ্রুবতারা

পঞ্চাশ বছর আগে, ২৪ এপ্রিল ছিল ভারতীয় গণতন্ত্রের একটি বড় মাইলফলক। বিশেষজ্ঞ মহলের বাইরে হয়তো সে দিন এই ঘটনার বিশাল তাৎপর্য জনগোচর হয়নি। কিন্তু পরবর্তী দশকগুলির ঘটনাবলি বুঝিয়ে দিয়েছে, ‘কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরল সরকার’ নামক মামলায় ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট সে দিন যে রায়ে পৌঁছেছিল, তার গুরুত্ব কত ব্যাপক ও মৌলিক। ভারতের সংবিধান সংশোধন করার লক্ষ্যে ভারতীয় সংসদের হাতে ক্ষমতা কত দূর, তা সীমাহীন কি না, এই ছিল সে দিনের বিচার্য বিষয়। দেশের দীর্ঘতম মামলায় ১৩ জন বিচারপতি সম্বলিত বেঞ্চে ৬৮ দিনব্যাপী শুনানির পর রায় দাঁড়িয়েছিল— সংসদ তথা শাসনবিভাগ সংবিধানের যে কোনও সংশোধন করতে পারে, যত ক্ষণ পর্যন্ত সংবিধান-প্রদত্ত কতকগুলি মৌলিক অধিকারে হাত না পড়ে। এই অধিকারগুলি একেবারেই মৌলিক, সুতরাং অ-সংশোধনীয় ও অ-পরিবর্তনীয়: সংবিধানের ‘বেসিক স্ট্রাকচার’ বা ‘মূল কাঠামো’ হিসাবেই তা অভিধাযোগ্য। অর্থাৎ, এই রায়ে এক দিকে সংবিধান সংশোধনে সংসদের ক্ষমতা অনেক দূর সমর্থিত হল, অন্য দিকে একটি লৌহযবনিকা টেনে দেওয়া হল তার ‘মূল কাঠামো’ রক্ষার্থে। কেরলবাসী গৈরিকবাস-পরিহিত এক সাধু ভারতের আইন-বিচার ও গণতন্ত্রের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় স্থান দখল করে নিলেন ঐতিহাসিক মামলাটির সূত্রে। গত ২৪ এপ্রিল অর্ধশতক পূর্তির দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য সর্বোচ্চ আদালতের তত্ত্বাবধানে শুভ-উন্মোচিত হল একটি স্মরণিকা ‘ওয়েবপেজ’।

মূল কাঠামো-র কতগুলি ক্ষেত্র নির্দেশিত হয়েছিল সে দিন, যেমন যুক্তরাষ্ট্রীয়তা, গণতন্ত্র ও ধর্মাচরণের স্বাধীনতা। পরবর্তী কালে এতে আরও কিছু ক্ষেত্র সংযোজিত হয়েছে, শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগের বহু বিরোধের মধ্যে এক প্রকার দিশা তৈরির প্রয়াস হয়েছে। সে দিনও এই মামলার মধ্য দিয়ে বিচারবিভাগের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সরকারের প্রবল দ্বন্দ্বের মীমাংসা হচ্ছিল, যাতে অবশেষে বিচারবিভাগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রসঙ্গত, তৎপূর্বে ইন্দিরা গান্ধী সরকার পর পর কয়েকটি সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত উল্টে দেয়, যেমন আর সি কুপার মামলা (১৯৭০), মাধবরাও সিন্ধিয়া মামলা (১৯৭০) এবং গোলকনাথ মামলা (১৯৬৭)। ফলত, এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, এই ঐতিহাসিক মামলায় কেশবানন্দ ভারতী নিজে মামলা হেরেও ভারতীয় গণতন্ত্রকে জিতিয়ে দেন— ঐতিহাসিক রায়ে ক্ষমতা-আগ্রাসী কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রের হাত থেকে মৌলিক অধিকারকে বাঁচিয়ে।

ঠিক এই কারণেই অর্ধশতক উদ্‌যাপনটি গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধানের মূল কাঠামোটির মান্যতা রক্ষা করে চলছে না, নানা প্রসঙ্গে এই অভিযোগ উঠছে যখন, তার মধ্যে এই মামলার সূত্রে সংবিধানের অলঙ্ঘ্য মূল কাঠামোটিকে স্মরণ সমগ্র দেশের নাগরিককেই বলীয়ান করে তুলতে পারে। প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়ের ভাষায়, সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক ব্যক্তি-অধিকারের মূল কাঠামোটিই হল ভারতীয় গণতন্ত্রের ‘ধ্রুবতারকা’। কলেজিয়াম নিয়ে সংসদের সঙ্গে বিচারবিভাগের আজ কঠিন সংঘর্ষ চলছে, আইনমন্ত্রী রিজিজু থেকে উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় সম্প্রতি আবারও বলেছেন, সংসদীয় গণতন্ত্রে সংসদই প্রধান, আদালত যেন সংসদের কাজে হস্তক্ষেপ না করে। কিন্তু, গণতন্ত্রের অর্থ তো কেবল সংসদমান্যতা নয়, সংবিধানমান্যতা: ব্যক্তি-অধিকার রক্ষাই যার লক্ষ্য। সুতরাং, সেই লক্ষ্যের বিচারবিভাগীয় বিবেচনা ব্যতীত সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত স্বেচ্ছাচারিতার অনৈতিক জবরদস্তিতে পৌঁছতে পারে। পঞ্চাশ বছর আগে সেই আশঙ্কা যত দূর সত্য ছিল, ২০২৩ সালের ভারতে তা অনেক গুণ বেশি। গণতন্ত্রের দীর্ঘজীবিতার স্বার্থেই সংসদের হাত থেকে সংবিধানের মূল কাঠামোটিকে সুরক্ষিত রাখা আজকের প্রথম জরুরি কাজ।

Indian Population জন-সম্পদ

চিনকে টপকে ভারত হয়ে উঠল বিশ্বের সর্বাধিক জনবহুল দেশ। সম্প্রতি রাষ্ট্রপুঞ্জের এক সমীক্ষায় এমনটাই জানা গিয়েছে। সমীক্ষা অনুসারে, জনসংখ্যায় চলতি বছরেই পড়শি রাষ্ট্রকে ছাপিয়েছে ভারত। এই সংবাদটি অনেককে উদ্বিগ্ন করবে— টমাস রবার্ট ম্যালথাস যেমন বিচলিত হয়েছিলেন প্রায় আড়াইশো বছর আগে। অষ্টাদশ শতকের এই ব্রিটিশ অর্থশাস্ত্রী ১৭৯৮ সালে তাঁর ‘অ্যান এসে অন দ্য প্রিন্সিপল অব পপুলেশন’-এ প্রকাশ করেছিলেন একটি মারাত্মক আশঙ্কা— কৃষি উৎপাদনের হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সঙ্গে তাল মেলাতে পারবে না, ফলে মানবসভ্যতা বারে বারেই সম্মুখীন হবে তীব্র অনটন, দুর্ভিক্ষের। সেই ধাক্কায় জনসংখ্যা নাটকীয় ভাবে হ্রাস পাবে, এবং ফিরে আসবে ‘স্বাভাবিক’ স্তরে। রাষ্ট্রনীতি, রাজনীতি বা সমাজনীতিতে কোনও অর্থনৈতিক চিন্তার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব যদি বিবেচ্য হয়, ম্যালথাসের তত্ত্বের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী মেলা ভার। কিন্তু ইতিহাস দেখিয়েছে যে, ভুল ছিলেন ম্যালথাস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বৈশ্বিক জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে এবং মাথাপিছু জিডিপি-ও বেড়েছে পাঁচ গুণ। প্রযুক্তির প্রভূত উন্নতি বরং জনসংখ্যাকে সম্পদে পরিণত করেছে। অতএব, ভারত বিশ্বের সর্বাধিক জনবহুল দেশ হয়ে ওঠায় উদ্বেগের কারণ নেই।

বরং তা ভারতকে ‘ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড’ বা জনসংখ্যায় তরুণ প্রজন্মের সংখ্যাধিক্যজনিত সুবিধা অর্জন করার সুযোগ এনে দিয়েছে। মূলত চারটি বিষয়ের উপরে নির্ভর করে এই ‘ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড’— কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও কর্মদক্ষতা, স্বাস্থ্য এবং সুশাসন। ভারত যদি তার কর্মক্ষম জনসংখ্যার জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে পারে, তা হলে তার ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড-এর সুফল অর্জনের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হবে। পাশাপাশি, উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা, কর্মদক্ষতা সৃষ্টি এবং বিভিন্ন ধরনের রোগ ও প্রতিবন্ধকতাকে প্রতিরোধ করে মানুষের জীবনসীমার বৃদ্ধির মাধ্যমেও দেশের আর্থিক সমৃদ্ধির পথ সুগম করা সম্ভব। একটি সুস্থ এবং দক্ষ কর্মীর দল শুধু উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে তা সরকারের আর্থিক চাপ কমায় এবং দেশের মূলধন সৃষ্টিতে সাহায্য করে। প্রসঙ্গত, ভারতের জনসংখ্যাই এ দেশকে বিশ্বে অন্যতম শক্তি করে তুলতে পারে। শুধু ক্রেতা হিসাবে নয়, শ্রমশক্তি হিসাবেও। দুনিয়ার তরুণতম দেশগুলির অন্যতম এখন ভারত। বিশ্বের কুড়ি শতাংশ কর্মক্ষম মানুষ আগামী পঁচিশ বছরে থাকবেন ভারতে। আর দেশের বাষট্টি শতাংশ মানুষ থাকবেন কর্মক্ষম বয়স-বন্ধনীতে। ফলে, ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড পাওয়া যাবে আগামী কয়েক দশকমাত্র।

সমস্যা হল, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রচুর প্রতিশ্রুতি মিললেও বাস্তবে রূপায়িত হয় নামমাত্র। দেশে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে কর্মসংস্থান বা স্বাস্থ্য পরিষেবার চিত্র আদৌ আশাব্যঞ্জক নয়। ফলে, গন্তব্য এবং পথ জানা থাকলেও সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে ভারত ‘কেপেবিলিটি ট্র্যাপ’-এ আটকে থাকে। এই বাধা থেকে বেরোতে হলে তাকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং উপযুক্ত নীতি-নির্ধারণের উপরে জোর দিতে হবে। সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান ও দক্ষিণ কোরিয়া ইতিমধ্যেই দেখিয়ে দিয়েছে কী ভাবে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড-এর সুফল অর্জন করা যায়। নিজেদের উন্নতির স্বার্থে ভারতেরও সেই পথে হাঁটা উচিত।

WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER dot COM -

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

Heat Wave in India উত্তাপের শিকার

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তীব্র তাপপ্রবাহ যে জীবিকার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে, সে সতর্কতা মিলেছিল অনেক আগেই। ভারতের প্রায় ৭৫ শতাংশ শ্রমশক্তি কাজ করে এমন পরিস্থিতিতে, যেখানে সূর্যালোক ও উচ্চ তাপমাত্রার প্রভাব এড়ানোর উপায় নেই। আগামী পাঁচ-ছ'বছরে অন্তত সাড়ে তিন কোটি কাজ হারাতে পারে ভারত। ১৯৯০ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে, ভারত বছরে গড়ে তেইশটি তাপপ্রবাহ দেখেছে, যা আগের ২০ বছরের তাপপ্রবাহের বার্ষিক গড়ের দ্বিগুণ। কেবল ২০২২ সালেই ২০২১-এর তুলনায় দ্বিগুণ বেশি তাপপ্রবাহ-সঙ্কুল দিন দেখেছে ভারত। ২০২৩ সালের সূচনাও আশঙ্কাজনক। তাপজনিত মৃত্যুহার বাড়ছে। অথচ, তাপ এড়ানোর উপায় নেই শ্রমিকের। দেশের অধিকাংশ নির্মাণ কাজ হয় শহরগুলিতে, যেখানে কংক্রিটের আধিক্য। তাপশোষণকারী কংক্রিট আশেপাশে এলাকার উত্তাপ বাড়ায়। শহরে আবদ্ধ গরম হাওয়ায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন বস্তিবাসীরা। এঁদের একটি বড় অংশ গ্রাম থেকে, এবং অন্যান্য রাজ্য থেকে আগত শ্রমজীবী মানুষ। বস্তির আবাসন প্রায়ই নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে তৈরি হয় যা পর্যাপ্ত তাপ নিরোধক নয়, বস্তির গঠনও বায়ুচলাচলের সহায়ক নয়। বহু শ্রমিক তাঁদের কর্মস্থলে, যেমন নির্মীয়মাণ ইমারতে, কিংবা রাস্তার ধারে প্লাস্টিক বা ত্রিপলের তাঁবুতে বাস করেন, যা তাঁদের জীবনীশক্তি ও কর্মশক্তির ক্ষয় করে।

উচ্চ তাপ শ্রমিকদের অনুপস্থিতি, এমনকি মৃত্যুরও কারণ হতে পারে। তার ফলে উৎপাদন হ্রাসের পরিমাণও কম নয়। এর প্রভাব পড়বে ভারতের জিডিপি-র উপরে— কোনও কোনও সমীক্ষা ২০৩০ সালের মধ্যে তিন শতাংশ হ্রাসের সম্ভাবনা দেখছে, কোনওটা ২০৩৫ সালের মধ্যে জিডিপি-র আড়াই শতাংশ হারানোর আশঙ্কা করছে। বিপন্নতা বাড়ছে দিনমজুরদেরও। এখনই গ্রীষ্মের গোড়ায় গরম এত তীব্র যে, একাধিক মহানগরে পূর্ণ কর্মদিবস কাজ হয় না। নানা ধরনের উৎপাদন, বিপণন, বিভিন্ন পরিষেবা, নির্মাণ কাজ, এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রের বিবিধ কাজ বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছে নিয়োগকারী সংস্থাগুলি। ফলে শ্রমিকদের প্রায়ই সম্পূর্ণ মজুরি মিলছে না। পরিবেশের সুরক্ষায় উদ্যোগী হবে বিভিন্ন দেশের সরকার, এমন আশা ক্রমশই কমে আসছে। ফলে বিশ্ব উষ্ণায়নের সঙ্গে মানিয়ে কী করে শ্রমিকের জীবন-জীবিকা সুরক্ষিত রাখা যায়, তার উপায় খুঁজতে হচ্ছে সরকার এবং শিল্প, উভয় ক্ষেত্রকেই।

তাপপ্রবাহের জন্য বিনষ্ট কর্মদিবসের ক্ষতি পূরণ করতে বহু দেশ সামাজিক সুরক্ষা প্রদানের পথ নিয়েছে। যেমন, কোন তাপমাত্রার উপরে উন্মুক্ত পরিবেশে কাজ বিপজ্জনক, তা ঘোষণা করা হচ্ছে। আবহাওয়ার আগাম সতর্কীকরণ, এবং সেই সব দিনে কর্মহীনতার জন্য শ্রমিকদের বিমা, বেকার ভাতা প্রভৃতি দেওয়ার নীতি নিয়েছে তৃতীয় বিশ্ব এবং ইউরোপের নানা দেশ। প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগে কর্মস্থলগুলিকে তাপ-নিরোধক করে তোলাও প্রয়োজন। সমস্যা এই যে, গত কয়েক বছরে শ্রম-সংক্রান্ত সরকারি বিধিগুলি ক্রমশ শিথিল হয়েছে। অস্থায়ী কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষা, কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য নিরাপত্তা, এ সব ব্যবস্থাই ভারতের নতুন শ্রমবিধি আরও শিথিল করেছে। এই পরিস্থিতিতে তাপপ্রবাহ-জনিত কর্মদিবস হ্রাস ও মজুরির ক্ষতি পূরণ করার কোন পথ নেবে সরকার, সে প্রশ্নটি অতিকায় হয়ে উঠেছে।

Same Sex Marriage ব্যক্তির স্বাধীনতা

সমলিঙ্গের দুই নাগরিকের বিবাহ আইনে স্বীকৃত হোক— এই মর্মে একগুচ্ছ আবেদন নিয়ে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে গত ১৮ এপ্রিল থেকে যে বিচার-বিশ্লেষণ চলছে, তার তাৎপর্য অশেষ। প্রশ্ন নিছক বিশেষ বিবাহ আইন সংশোধনের নয়, এই মামলা বিবাহ নামক ব্যবস্থাটি নিয়ে নতুন করে ও গভীর ভাবে চিন্তা করার সুযোগ দিয়েছে এবং সেই সূত্রে সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্ক কী হবে সেই বৃহৎ প্রশ্নটিও যাচাইয়ের অবকাশ সৃষ্টি করেছে। প্রধান বিচারপতি ধনঞ্জয় যশবন্ত চন্দ্রচূড় এবং অন্য চার বিচারক বিভিন্ন দিক থেকে এই বিষয়ে যে আলো ফেলেছেন, তা আরও এক বার বুঝিয়ে দেয়, ভারতীয় গণতন্ত্রের সুস্বাস্থ্যের রক্ষাকবচ হিসাবে বিচারব্যবস্থা তথা সুপ্রিম কোর্ট কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। ময়দানি রাজনীতি দূরস্থান, এই দেশের আইনসভাতেও এই মানের পর্যালোচনা এখন বিরলের মধ্যে বিরলতম বললে অত্যুক্তি হয় না। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী য়ুরগেন হাবারমাস ‘ডেলিবারেটিভ ডেমোক্র্যাসি’ বা আলোচনা-নির্ভর গণতন্ত্রের বিকাশে বিচারপতিদের মতবিনিময় ও বিশ্লেষণের উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। সেই তত্ত্ব নিয়ে অনেক তর্ক, কিন্তু তার গুরুত্ব আজকের ভারতে অত্যন্ত স্পষ্ট।

বলা বাহুল্য, কেন্দ্রীয় সরকার এই স্বীকৃতির বিরোধী। তাদের মতে, বিবাহ সংক্রান্ত আইন সংশোধনের প্রশ্নটি আইনসভার বিচার্য, আদালতের নয়। এবং কেবল জনপ্রতিনিধিমণ্ডলী নয়, জনসাধারণের উপরেও এ-ব্যাপারে শাসকদের ভরসা অপরিসীম। তাঁদের নিশ্চিত প্রত্যয়: ‘এ-সব’ হল শহুরে ‘এলিট’ বা উচ্চকোটির দাবি, আমজনতা বিবাহ বলতে পুরুষ এবং নারীর বিবাহই বোঝেন। প্রসঙ্গত, ভারতের বার কাউন্সিল রায় দিয়েছে, দেশের ৯৯.৯ শতাংশের বেশি মানুষ সমলিঙ্গ-বিবাহকে স্বীকৃতি দিতে নারাজ। কোন সমীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান এই পরিসংখ্যানের উৎস, তা অবশ্য জানা যায়নি। তবে দেশের অধিকাংশ নাগরিক যদি সমলিঙ্গের বিবাহকে স্বীকৃতি দেওয়ার বিরোধী হন, বিস্ময়ের হেতু নেই। এই সত্যটি জানেন বলেই শাসকরা নানা ভাবে প্রশ্নটিকে জনতার দরবারে নিয়ে যেতে ব্যগ্র— সব ব্যাপারে যাঁরা রাজ্যের ক্ষমতা খর্ব করতে ব্যস্ত তাঁরা আগ বাড়িয়ে এই বিষয়ে রাজ্য সরকারগুলির মতামত জানবার প্রস্তাব পেশ করেছেন!

এই বিষয়ে বিচার-বিবেচনার শেষে মহামান্য আদালত যে সিদ্ধান্ত স্থির করবেন, তা অবশ্যই শিরোধার্য। কিন্তু বৃহত্তর একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার। সামাজিক সংস্কার যদি সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটেই সম্পাদন করতে হত, তবে আজও বহু প্রাচীন কুপ্রথাই বহাল থাকত। প্রশ্ন ভোটের নয়, বনিয়াদি ব্যক্তিস্বাধীনতার। দুনিয়ার যে সব দেশে— এই মুহূর্তে ভারতের ‘নেতৃত্বে’ চালিত জি২০ গোষ্ঠীর অধিকাংশ দেশেও— সমলিঙ্গের বিবাহ স্বীকৃত, সেখানে ব্যক্তিস্বাধীনতার যুক্তিই মান্য হয়েছে। লক্ষণীয়, প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেছেন যে, বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠান বা ব্যবস্থাটি নিষ্প্রাণ বা নিশ্চল নয়, বিবর্তনশীল। যাঁরা স্কুলের পাঠ্যবই থেকে ডারউইনকে নির্বাসন দেন তাঁরা এই মন্তব্যের মর্ম বুঝবেন বলে মনে হয় না। এ-কথা বুঝবার সাধ্যও সম্ভবত তাঁদের নেই যে, ‘সমাজ এখনও প্রস্তুত নয়’ বলে বা অন্য ধরনের কল্পিত সমস্যার অজুহাত দিয়ে যাঁরা সমলিঙ্গ-বিবাহকে স্বীকৃতি দেওয়ার বিরোধিতা করছেন, তাঁরা ব্যক্তিস্বাধীনতার মৌলিক শর্তকে লঙ্ঘন করছেন। সমাজ যদি অপ্রস্তুত হয়, প্রস্তুত হয়ে ওঠার দায় তারই। চিরকালই অগ্রবর্তী নাগরিকদের নেতৃত্বে সামাজিক রীতিনীতি পাল্টায়, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সেই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নতুন অভ্যাসে অভ্যস্ত হন। সঙ্ঘ পরিবারের কাছে অগ্রবর্তী চিন্তার প্রত্যাশা করা বাতুলতামাত্র। অন্য অধিকাংশ দলের মতিগতিও আশা জাগায় না। তবে, প্রশ্নের ঢেউ উঠেছে।

WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER dot COM -

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

University Grants Commission উচ্চশিক্ষার ভাষা

তাৎক্ষণিক ও সুদূরপ্রসারী লাভের মধ্যে ফারাকটা দূরদৃষ্টির। ভারতে উচ্চশিক্ষার নীতি-নিয়ামকরা সুদূরপ্রসারী সুফলের কথা বলেন, তাঁদের কাজে দূরদর্শিতার ছাপ থাকে কি? বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) সম্প্রতি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে চিঠি পাঠিয়ে বলল, কোর্স বা পঠনপাঠন ইংরেজিতে হলেও যেন পড়ুয়াদের মাতৃভাষা বা প্রধান আঞ্চলিক ভাষায় পরীক্ষা দিতে দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যেন শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় আঞ্চলিক বা স্থানীয় ভাষাকে গ্রহণ করে, ইংরেজি থেকে পাঠ্যবইগুলি ভারতীয় ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করে। এই সবই শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতীয় ভাষার প্রচার-প্রসারে, শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ভাষাগুলির গুরুত্ব বাড়াতে। তা ছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা আর্থ-সামাজিক অবস্থানের পড়ুয়ারা পড়তে আসেন, অনেকেই ইংরেজি ভাল জানেন না বা লিখতে পারেন না, মাতৃভাষা তথা আঞ্চলিক ভাষায় পরীক্ষা দিতে পারলে এই ছাত্রদেরও সুবিধা হবে, ভারতীয় ভাষার কল্যাণে হীনম্মন্যতা দূর হয়ে ব্যক্তিত্বের বিকাশ হবে, সেও বড় পাওয়া।

এই সবই তত্ত্বগত ভাবে শুনতে ভাল, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ে সতর্ক হওয়া চাই। উচ্চশিক্ষা মানে কি স্রেফ ইংরেজিতে দুর্বল পড়ুয়াদের মাতৃভাষা সহায়ে পরীক্ষার বৈতরণি পেরোনো? ইউজিসি যেমন বলছে, সেই মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষার চর্চা নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ, অতি জরুরিও, কিন্তু একুশ শতকে উচ্চশিক্ষার পরিসরে ইংরেজির পরিবর্তে বা তাকে বাদ দিয়ে তা হতে পারে না। ইংরেজিতে দুর্বল ছাত্রদের মাতৃভাষায় পরীক্ষায় লিখতে দিলে তাঁরা তাৎক্ষণিক সঙ্কট উতরে যেতে পারেন, কিন্তু ‘উচ্চ’শিক্ষার উচ্চতায় পৌঁছতে পারবেন বলে মনে হয় না। তর্কের খাতিরে যদি ধরা যায় যে, এ রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সার্বিক ভাবে বাংলা ভাষা, কিংবা পুরুলিয়ায় বা কোচবিহারে স্থানিক ভাষায় পরীক্ষা দেওয়ার বা গবেষণা-সন্দর্ভ জমা দেওয়ার বন্দোবস্ত হল, সেই পড়ুয়া নিজের এলাকার বাইরে যেতে চাইলেই কিন্তু আটকে যেতে পারেন। উপরন্তু মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষায় পঠনপাঠন পরীক্ষা ইত্যাদির পরিকাঠামো বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এখনও অপ্রতুল। মূল পাঠ্যবইগুলির বাংলা বা স্থানীয় ভাষায় সুলভ অনুবাদ, মাতৃভাষায় পরিভাষা তৈরি, গুণমানে মূলের সমকক্ষতা— এই সবই নিশ্চিত না করে স্রেফ পরীক্ষা পাশের জন্য মাতৃভাষা বা স্থানীয় ভাষার আশ্রয় নিলে তা শিক্ষার্থীকে বরং বেঁধে রাখবে সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে।

উচ্চশিক্ষা মানে একটি বিষয়ের আশ্রয়ে জ্ঞানচর্চার দিগন্ত প্রসারিত করা। এই প্রক্রিয়াটি স্থানিক নয়, সার্বিক; আঞ্চলিকতা ছাড়িয়ে বৈশ্বিকতায় উত্তীর্ণ, এ জন্যই প্রতিষ্ঠানটি ‘বিশ্ব’বিদ্যালয়। বিদ্যা তথা জ্ঞানের উন্মোচনে ভাষাজ্ঞানের প্রসার অতি জরুরি, বিশেষত সেটি যা বিশ্বচিন্তকদের চর্চার ভাষা। উচ্চশিক্ষায় মূল্যায়নও অতি জরুরি, প্রকল্প বা গবেষণা শেষে যা পাওয়া গেল তা যেন অনেকের কাছে পৌঁছতে পারে, তা নিশ্চিত করা দরকার। কেবল ডিগ্রি-লাভে নয়, বহু মতের সংযোগেই সেই শিক্ষার সার্থকতা। আঞ্চলিক ভাষায় এই সংযোগ নিশ্চয়ই সম্ভব, তারও বেশি সম্ভব ইংরেজিতে। কেউ উচ্চশিক্ষিত হয়ে আঞ্চলিক ভাষায় সমৃদ্ধ গবেষণা-সন্দর্ভ লিখলে তা অত্যন্ত বড় প্রাপ্তি। কিন্তু দরকার উল্টোটিও— মাতৃভাষাটি ভাল করে জানা, এবং অন্যান্য ভাষার হাত ধরে পৌঁছে যাওয়া বিশ্বপ্রাঙ্গণে।

WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER dot COM -

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

Hunger Crisis শিশুর খিদে

ভারতে শিশুর ক্ষুধার বহর নতুন নিরিখে পরিমাপ করে একটি আন্তর্জাতিক সমীক্ষা দেখাল এক উদ্বেগজনক ছবি। এখনও দু'বছর বয়স হয়নি, অথচ দিনভর অভুক্ত থাকছে, ভারতে এমন শিশুর সংখ্যা ঊনষাট লক্ষ। এই তথ্য মিলেছে জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষার পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে, যা সরকারি তথ্য। এত দিন বয়স অনুপাতে শিশুর ওজনের স্বল্পতা (ওয়েস্টিং) এবং দৈর্ঘ্যের স্বল্পতা (স্টান্টিং) দিয়ে মাপা হত শিশু অপুষ্টি। এই প্রথম খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ খতিয়ে দেখা হল, এবং বোঝা গেল যে, ছ'মাস থেকে তেইশ মাস বয়সের শিশুদের প্রায় কুড়ি শতাংশেরই একটা গোটা দিন অভুক্ত থাকার ঝুঁকি রয়েছে। আরও আক্ষেপের কথা, ২০১৬ সাল থেকে ২০২১ সালের মধ্যে এই চিত্রে কোনও উন্নতি হয়নি, বরং সামান্য অবনতি হয়েছে। সব রাজ্যে অবশ্যই এই ছবি এক নয়— পশ্চিমবঙ্গ-সহ কুড়িটি রাজ্যে 'খালিপেট' শিশুর অনুপাত কমেছে। কিন্তু উত্তরপ্রদেশ এবং ছত্তীসগঢ়, এই দু'টি রাজ্যে এমন খাদ্যবঞ্চনা এতই বেড়েছে যে, জাতীয় গড়ে তার বিরূপ প্রভাব পড়েছে। গবেষকরা জানিয়েছেন, শিশুদের খাদ্যবঞ্চনার সম্পূর্ণ ছবি এই সমীক্ষা থেকে পাওয়া সম্ভব নয়— হয়তো এই ঊনষাট লক্ষ শিশুর অনেকেই একাধিক দিন খাদ্য পায়নি, বা পুষ্টিগুণহীন খাদ্য পেয়েছে। তবে এত ছোট শিশুদের মধ্যে ক্ষুধার এই ব্যাপ্তি আগে এত স্পষ্ট হয়নি। ২০১৫-১৬ থেকে ২০১৯-২০ সালের মধ্যে 'স্টান্টিং' এবং 'ওয়েস্টিং'-এর হার ভারতে কিছু কমেছে। কেন্দ্র একেই 'সাফল্য' বলে দাবি করে আসছে। এখন খাদ্য বঞ্চনার এই চিত্র নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে।

প্রথম চিন্তাটি খাদ্যসুরক্ষা নিয়ে। ভারতকে ক্ষুধাশূন্য করা, সকলের জন্য যথেষ্ট খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করার যে লক্ষ্য ভারত গ্রহণ করেছে রাষ্ট্রপুঞ্জের 'সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্য'-র অংশ হিসাবে, তার দিশা অস্পষ্ট। আজও ভারতে তিন জন শিশুর মধ্যে অন্তত এক জন অপুষ্ট। ২০২১ সালের গ্লোবাল নিউট্রিশন রিপোর্ট বলছে, সদ্যোজাতের ওজনে ঘাটতি, শিশু অপুষ্টি, মায়ের মৃত্যুহার, রক্তাল্পতা— প্রতিটি নিরিখেই ভারত পিছিয়েছে। অতএব, ভারতের খাদ্য সুরক্ষা নীতির ফের পর্যালোচনা প্রয়োজন। অঙ্গনওয়াড়ি প্রকল্পের অধীনে ছ'মাস থেকে তিন বছরের শিশুর জন্য প্রত্যহ পাঁচশো ক্যালরি সম্পন্ন খাবার (যথেষ্ট প্রোটিন-সহ) সরবরাহ হওয়ার কথা। তা সত্ত্বেও কেন এই বয়সের শিশুদের মধ্যে ক্ষুধার প্রকোপ এত বেশি? তার কারণ, বরাদ্দের অপ্রতুলতা, কর্মীর অভাব এবং নজরদারির গাফিলতিতে বিপন্ন এই প্রকল্পটিই।

অথচ, এই প্রকল্পটিই সার্থক ভাবে কাজ করলে প্রশমিত হত দ্বিতীয় উদ্বেগটি— শিশুর পারিবারিক ও সামাজিক নিরাপত্তার অভাব। অতি ছোট শিশুর অভুক্ত থাকার কারণ কেবল খাদ্যাভাব নয়, তাকে খাইয়ে দেওয়ার লোকের অভাব। দরিদ্র পরিবারের মা কাজে বেরোতে বাধ্য হলে শিশুর পরিচর্যা অবহেলিত হয়, এ-ও শিশু-অপুষ্টির কারণ। দরিদ্র, শ্রমজীবী এলাকাগুলিতে সারা দিনব্যাপী অঙ্গনওয়াড়ি, বা ক্রেশ চালানো তাই প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞরা শিশুর চাহিদাগুলি চিহ্নিত করে নির্দিষ্ট ভাবে সেগুলি পূরণ করার পরামর্শ দিয়েছেন। বিশাল প্রকল্পের বিপুল বরাদ্দের প্রচার থেকে সে ক্ষেত্রে বেরোতে হবে নেতাদের। তাঁদের ভোটের খিদেতে রাশ টানলে হয়তো শিশুর পেট ভরতে পারে।

WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER dot COM -

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

National Education Policy অপরীক্ষিত

পরীক্ষা, না কি ভিন্ন পথে মূল্যায়ন? ভারতে স্কুলশিক্ষার বর্তমান নীতি-নির্ধারকদের কাছে এই দুইয়ের সংঘাত বাধছে প্রতিনিয়ত, তারই প্রভাব পড়ছে নানা ঘোষণায়। সম্প্রতি স্কুলশিক্ষার জাতীয় পাঠ্যক্রম কাঠামো (ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক বা এনসিএফ)-র প্রাথমিক খসড়ায় প্রস্তাব করা হল যে, দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াদের কোনও পরীক্ষা নেওয়াটা উচিত কাজ হবে না, লিখিত পরীক্ষা শুরু হোক তৃতীয় শ্রেণি থেকে। শিশুর কাছে পরীক্ষা একটা বোঝা হয়ে দাঁড়াবে, এই ধারণা ও আশঙ্কা থেকেই খসড়ায় বলা হয়েছে বনিয়াদি স্তরে অন্যতর মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার কথা— শিশুর পর্যবেক্ষণ শক্তি ও স্বাভাবিক প্রবণতাগুলি দেখে তার মূল্যায়নের কথা। প্রতিটি শিশুর শেখার প্রক্রিয়া যেমন আলাদা, তাদের প্রকাশভঙ্গিও আলাদা; সেটি বুঝে স্কুলে তাদের অগ্রগতির খতিয়ান রাখতে হবে, এমনই প্রস্তাব করা হয়েছে।

বুনিয়াদি স্তরের শিক্ষা নিয়ে নীতি-নির্ধারকদের এই চিন্তা এবং উদ্বেগ স্বাগত। কিন্তু এ কথাটি তলিয়ে ভাবা দরকার— লিখিত পরীক্ষাকে তৃতীয় শ্রেণি অবধি পিছিয়ে দিলে শিশুদের প্রকৃত মূল্যায়ন কি সত্যিই হবে? পরীক্ষার পক্ষে-বিপক্ষে নানা যুক্তি: কেউ বলেন, বিনা পরীক্ষায় এক ক্লাস থেকে অন্য ক্লাসে উত্তীর্ণ হলে শিশুদের লেখাপড়ায় আগ্রহ থাকে না; অন্যরা বলেন, স্কুলের মূল কাজ শিশুকে শেখানোর ক্ষেত্রে পথ দেখানো, সাহায্য করা, পরীক্ষা নেওয়া নয়— বরং পরীক্ষামুখী শিক্ষাব্যবস্থায় একটা চরম ফাঁকি এসে পড়ে, শিশুর সামগ্রিক বিকাশের খোঁজ থাকে না। এই সমস্ত তর্কের ও-পারে প্রাথমিক শিক্ষার প্রকৃত চিত্রটি মোটেই আশা জোগায় না; খবরের কাগজের সংবাদ থেকে শুরু করে নানা অসরকারি শিক্ষা-সংস্থার রিপোর্টেও প্রায়ই উঠে আসে করুণ ছবিটি। নিচু ক্লাসে পরীক্ষার বিভীষিকা না রাখা শিশুদের শেখার পথকে সহজ করতে পারে, কিন্তু তার জন্য শেখানোর কাজটিতে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। অভিযোগ যে, প্রাইমারি স্তরে বহু শিক্ষক এমনিতেই পড়ান না— আশঙ্কা হয়, বিনা পরীক্ষাতেই ছাত্ররা ক্লাসে উঠে যাবে, এমন আশ্বাস থাকলে তাঁরা সেটুকুও পড়াবেন না। ফলে, শিক্ষাব্যবস্থার গোড়াটি আরও দুর্বল হবে।

বরং দরকার শিক্ষকদের মূল্যায়ন। পরীক্ষাহীন পদ্ধতির সিঁড়ি বেয়ে তথাকথিত উঁচু ক্লাসে উঠেও যে শিশুরা সাধারণ অক্ষরজ্ঞান, বানান, গণিতের গোড়ার পাঠ শেখেনি, তাদের অপারগতার দায় তাদের নয়, তাদের শিক্ষকদের— তাঁরা ক্লাসে মন দিয়ে পড়াননি বা শেখাননি। বনিয়াদি শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুদের মন ও প্রবণতা বুঝে তাদের শেখানোর কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু বাস্তবে শিক্ষকরা কী ভাবে শেখাচ্ছেন, আদৌ শেখাচ্ছেন কি না তার নজরদারি দূরস্থান, সামান্য খোঁজটুকুও নেই। কেউ বলতে পারেন যে, শিক্ষকেরা শিক্ষাদান ছাড়াও বহু কাজে ব্যস্ত, মিড-ডে মিলের হিসাব থেকে ‘ভোটের ডিউটি’, ‘দুয়ারে সরকার’, সবেতেই তাঁদের থাকতে হয়। কিন্তু তাতে ক্লাসে মন দিয়ে পড়ানোর মতো গোড়ার কাজটির গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা কমে না। বিদেশে শিক্ষার প্রতিটি স্তরে শিক্ষকের মূল্যায়ন হয়, ছাত্রদের মতোই শিক্ষকদেরও ক্রমোন্নতি সেখানে আবশ্যক। এই মূল্যায়ন দরকার এখানেও। দারিদ্র, অতিমারি থেকে গ্রীষ্মের খরদহন পর্যন্ত যে দেশে পড়ুয়াদের পদে পদে পরীক্ষা নেয়, সেখানে অপরীক্ষিত শিক্ষক কাজের কথা নয়।

WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER

Practice Paper –live practice 9.30pm

Fees : 100 / month

- **বাড়ি থেকে পরীক্ষা -*প্রশ্নপত্র দেওয়া হবে -*pdf করে লিখে পাঠাতে হবে। সপ্তাহে সোমবার ও শুক্রবার

print করে খাতা দেখা হবে । খাতা দেখার পর মোডেল উত্তরপত্র দেওয়া হবে ।লেখাগুলো 7047352328 নাম্বারে পাঠাতে হবে

- বেতন :₹ 100 টাকা প্রতিমাস ।
- WhatsApp : 7047352328